# সময় অসময়ের গল্প

অনিরুদ্ধ রাহা

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

# প্রাগভাষ

'মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ এক একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটোগল্প'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছোটোগল্প প্রসঙ্গে এ উক্তি বোধহয় আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশ সহ বিশ্বমনীষার অনেক প্রবাদপ্রতিম গল্পকার 'ছোটোগল্প'কে ভিন্নতর এক শিল্পরূপে ভেবেছেন। ছোটোগল্প নিয়ে নানান মত ও গবেষণায় একটি বিষয়, সুপ্রতিষ্ঠিত যে অবয়বে ছোটো হলেই যে কোনও গল্প 'ছোটোগল্প' নয়। এডগার অ্যালান পো, ব্রান্ডার ম্যাথিউজ এবং আরও অনেকেরই মতে 'ছোটোগল্প' একটি শিল্পরূপ যা স্বকীয় বৈশিষ্টে ভাস্বর। তার কাহিনি এগিয়ে চলে স্থির এক লক্ষ্যের দিকে কোনও রকম বাহুল্য ছাড়াই। নিজস্ব ছন্দে কিছুটা নাটকীয়ভাবেই সে উপনিত হবে ক্লাইম্যাক্সে। কিন্তু সমস্ত সফল ছোটোগল্পেই যে এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কাহিনির গতি তা নয়। বরং মূল শিল্পরূপ থেকে না সরে সময়ের স্বাভাবিক দাবী মেনে নতুন নতুন ভাবে লেখা হয়েছে ছোটোগল্প। নাটকীয় পরিণতির অবশ্যম্ভাবী হাতছানির পরিবর্তে গল্পের স্বচ্ছন্দ গতির গভীরে শুধু ইঙ্গিতমাত্র রেখে পাঠকের স্বকীয় ব্যাখ্যা ও ভাবনার উপর আস্থাশীল হতে চেয়েছেন অনেক গল্পকার।

বাংলা ছোটোগল্পের গৌরবময় ইতিহাস এবং বরেণ্য গল্পকারদের সারণী অতি দীর্ঘ। নতুন এবং সাধারণ কারুর পক্ষে অগ্রজদের এই অসামান্য কৃতিত্বের ইতিহাসে সামান্যতম সংযোজনও প্রায় দুঃসাধ্য। বাংলা ছোটোগল্পের পরিপূর্ণ সংসারে নতুন আগন্তুক-এর স্থান মেলা ভার। তবু স্বপ্ন পিছু ছাড়ে না। চিন্তন-এর গভীরে কোথাও হয়তো অনুরণিত হয় ১৮৯০ সালে বেঞ্জিন-এর রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার বর্ণনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক আগস্ট কেকুলের সেই অসাধারণ উক্তি—'Let us learn to dream, gentlemen, and then perhaps we shall learn the truth...'

স্বপ্ন, কল্পনা, অভিজ্ঞতা, নানামাত্রিক জিজ্ঞাসা এবং অবশ্যই উপলব্ধি—এ সবের হাতছানিতেই বোধহয় আমারই মতো কেউ কেউ আজও দুঃসাহস করে নতুন নতুন গল্প বলার। স্মৃতির গহীন থেকে হয়তো উঁকি দেয় বর্নোজ্জ্বল বা ধূসর কোনও চরিত্র।

কালযাপনের আপাত দৈনন্দিনতায় তাদেরই কেউ কেউ হয়তো সৃষ্টি করে ফেলে রামধনু রঙা একটা ছোটোগল্প নির্বাক মুগ্ধতায় ভর করে হয়তো লিখে ফেলি চেনা অচেনা জীবনকথা; হয়তো কোথাও মিশে থাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ। মনে হয় যদি একটুখানি পরিশোধ হয় জীবনের কাছে আমার অসীম ঋণ। আবারও একটা ছোটোগল্প সংকলনের ভাবনার নেপথ্যে এই আমার অকপট জবাবদিহি।

পরপর দুটি ইংরেজি উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর যাঁদের উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে বাংলায় ছোটোগল্প লেখার শুরু তাঁদের তালিকা দীর্ঘ। শ্রী সৌমিত্র লাহিড়ী, শ্রী অনিল আচার্য, শ্রী অলক চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় এবং আমার শুভানুধ্যায়ী পরিজনদের প্রতি আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জানানোর এ সুযোগ আমার পরম প্রাপ্তি।

এ পর্যন্ত আমার তিনটি ইংরেজি উপন্যাস প্রকাশের যিনি দুঃসাহস দেখিয়েছেন, পুনশ্চর কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ককে শুধুমাত্র সম্মান বা কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের অবমাননা হয়। তাঁর হাত ধরেই তো এই স্বপ্নের পথচলা। পুনশ্চ প্রকাশন—এর সকলের সাথে যে সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হয়েছে তার মূল্য নিরূপনে আমি অক্ষম। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলা ছোটোগল্পের পাঠক সমাজের বিদগ্ধতা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যের এই বিপুল সমৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ তার গুনগ্রাহী পাঠকবৃন্দ। দুঃসাহসে ভর করে আঠারোটি গল্পের এই সংকলন হাজির হলো তাঁদেরই দরবারে। তাঁদের মূল্যায়নেই তো এ বই-এর সাফল্য—অসাফল্য ...

অনিরুদ্ধ রায়

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| শেষ বসন্ত | ..... | ০৯ |
| বনজ্যোৎস্নায় | ..... | ১৭ |
| শূন্যতার সঙ্গে | ..... | ২৫ |
| অপরাজিত | ..... | ৩৪ |
| একটু কেবল | ..... | ৪২ |
| অপার | ..... | ৪৭ |
| অন্তরাগ | ..... | ৫৯ |
| নিরুদ্দেশ | ..... | ৬৮ |
| শেষকৃত্য | ..... | ৭৯ |
| আহত | ..... | ৮৮ |
| বিকীর্ণ | ..... | ১০০ |
| একান্ত গোপনীয় | ..... | ১১২ |
| বেওয়ারিশ | ..... | ১২১ |
| জলাভূমির পাখিরা | ..... | ১৩১ |
| কালযাপন | ..... | ১৩৭ |
| অব্যক্ত | ..... | ১৪৫ |
| স্বপ্নসন্ধ্যা ও মৎসকন্যার আখ্যান | ..... | ১৫৪ |
| ফেরা | ..... | ১৬০ |

# শেষ বসন্ত

পলাশবনির বাজার পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই ছোট্ট চায়ের দোকান। ঢেউ ওঠা মাঠের মাঝ বরাবর লালমাটির রাস্তাটা সোজা চলে গেছে দিগন্তের তালগাছের সারির দিকে। ওদিকে নাকি একটা গ্রাম আছে আদিবাসীদের। মুড়াশোল।

সাত বছর আগে পলাশবনি ছিল নেহাত একটা গ্রাম। কারখানাটা সবে হয়েছে তখন। হাসপাতালটা ছিল কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির প্রজেক্ট রিপোর্টের পাতায়। ধীমান তার দলবল নিয়ে এসেছিল হাসপাতাল তৈরির প্রাথমিক কাজকর্ম সারতে। পলাশবনির প্রেমে পড়েছিল প্রথম দর্শনেই। প্রায় আসতে হত তখন। গড়ে উঠেছিল একশো শয্যার মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল। রোজ ভোরে কারখানার গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধীমান চলে আসত চায়ের দোকানটায়। মাটির ভাঁড়ে ধোঁয়া গন্ধ চা আর গরম জিলিপি এনে দিত ছোট্ট রতন। জিলিপিতে একটু তেলচিটে গন্ধ। কিন্তু ভালোই লাগত ধীমানের।

মাস দশেক পর হাসপাতালের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন। পলাশবনি আসার সময় কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'যাবে নাকি?'

'আমি। ইমপসিবল...আমাদের নতুন তিনটে প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে সামনের মাসে।'

তবে আরও তিনমাস পর হাসপাতাল চালু হওয়ার দিন এসেছিল কৌশিকী। আরও অনেকেই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় আদিবাসীদের বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুগ্ধ কৌশিকী। মোহিত গর্গ-এর স্ত্রী পল্লবী ওকে ডাকতেই হাতে হাত ধরে আগুন ঘিরে পাতা নাচের ছন্দে কোমর দোলাতে থাকে। সামান্য দূরে বসে সিভ্যাস রিগ্যালে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিতে দিতে হারিয়ে যাচ্ছিল ধীমান। আগুনের আভায় কৌশিকী যেন অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া সেই বান্ধবী। ফেলে আসা বছরগুলোয় নিঃসাড়ে জমতে থাকা বরফের পাহাড়টা গলতে শুরু করে আগুনের উত্তাপে। হঠাৎই রয়াল কলেজ অফ সার্জনস-এর ছাত্র ধীমান হাইড পার্কে সার্পেনটাইন-এর পাশ দিয়ে আবার হাঁটতে থাকে লন্ডন স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-এর ছাত্রী কৌশিকীকে নিয়ে।

গেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়িয়েছিল ধীমান। স্নান সেরে রাতের পোশাকে ব্যালকনিতে আসে কৌশিকী। সমস্ত বরফ পার হয়ে তখন শুধুই ফেলে আসা সময়ের স্মৃতির উষ্ণতা। বেড সাইড ল্যাম্পের মৃদু আলো কাচের দরজার বাইরে এসে প্রায়ান্ধকার ব্যালকনিতে এঁকে দিয়েছিল পরম এক মুহূর্তের ইশারা।

'কিছু নেবে?'

'নাঃ, এখন ড্রিঙ্কস নিতে বসলে সকালে উঠতে পারব না। কাল আমাকে অফিস যেতেই হবে...বরং একটা সিগারেট দাও' 'অফিস না গেলেই নয়? আজকের রাতটা...।' ওর দিকে সিগারেট-এর প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলতে যাচ্ছিল ধীমান। ঠিক তখনই কৌশিকী বলে, 'তোমাকে বলা হয়নি...চেয়ারম্যান আমাকে একটা অফার দিয়েছেন।

অফিসের কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। তবু প্রশ্ন করে ধীমান, 'কী?'

'আ অ্যাম হিজ চয়েস অ্যাজ দ্য হেড অফ আওয়ার ফ্রাঙ্কফুর্ট ইউনিট।'

'তুমি যাবে?'

'ইটস আ বিগ অপরচুনিটি ধীমান।' একটু থেমে কৌশিকী বলে, 'সামনের মাসে যাচ্ছি'।

'সামনের মাসেই। কবে ঠিক হল?'

'মাস দেড়েক আগে'।

'ও'।

'একটা চা দিস রতন'

কাঠের বেঞ্চে বসে সামনের ধু ধু রাস্তাটার দিকে তাকায় ধীমান। অনেকদিন পর পলাশবনি আসা হল। আসার দরকারও নেই আর। সৌগতর দায়িত্বে হাসপাতাল চলছে পুরোদমে। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুদের সম্পর্ক খুবই ভালো। আশপাশের গ্রামে মাঝে মাঝে হেলথ ক্যাম্পও করে। ধীমান ব্যস্ত ওদের কোম্পানির নতুন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে। ছুটে বেড়াতে হয় দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কিন্তু পলাশবনি কোনো এক অজানা মায়ায় বেঁধেছে ওকে। বারে বারে ছুটে আসতে চায় মন। গেস্ট হাউসের ব্যালকনিটায় থমকে আছে একটা সময়। এখানে এলে কখনও হয়তো বা গোটা রাতটাই কেটে যায় ব্যালকনিতে বসে। সকাল হলে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে চায়ের দোকানটায়।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিগন্তের তালসারির দিকে তাকিয়ে থাকে ধীমান। হাটবার ছাড়া লোক চলাচল কম এই পথটায়। গাড়ি তো ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। আদিবাসী গ্রামটায় যেতে ইচ্ছা করে রাস্তাটার দিকে তাকালেই।

'রতন'—

'উ'—

'ওই দিকে একটা গ্রাম আছে না?'

'আছে তো... মুড়াশোল ইস্কুলও আছে, ইত্তো বড়ো।' দুহাত ফাঁক করে স্কুলের মাপ দেখায় রতন।

'বড়ো স্কুল। ওখানে?'

'আছে তো... কত্তো ছানা থাকে!'

'তাই নাকি। বোর্ডিং স্কুল। বাঃ... তুই গেছিস?'

'গেছি তো। সরস্বতী পুজোয় কত্তো খাওয়ায়। সব্বাই যায়।'

'বাঃ। আমাকে নিয়ে যাবি?'

'হ্যাঁ... ডাক্তারবাবুরা গেছে তো।'

'তাই নাকি, তুই জানলি কী করে?'

'হাসপাতালের গাড়ি যায়। দেখেছি তো।'

দুপুরে খেতে বসে ধীমান জিজ্ঞাসা করে, 'মুড়াশোলে স্কুল আছে?'

'আছে স্যার। গভর্নমেন্ট স্কুল...ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার... রেসিডেন্সিয়াল।'

'তোমরা গেছ?'

'হ্যাঁ স্যার, ওদের প্রিন্সিপাল বাচ্চাদের হেলথ চেক আপ-এর জন্যে রিকোয়েস্ট করেছিলেন। ভদ্রমহিলা খুব ডেডিকেটেড।'

'তাই, আমি জানতামই না।'

'আপনাকে বলা হয়নি স্যার...সরি স্যার।' অপ্রতিভ হয় সৌগত।

'না, না...সেজন্য না। আসলে আমার ধারণাই ছিল না যে ওখানে একটা বড়ো স্কুল থাকতে পারে।'

'যাবেন স্যার? আপনার ভালো লাগবে।'

'যাওয়া যেতেই পারে...বিকেলের দিকে।'

লালধুলোর ঝড় তুলে মুড়াশোলে ঢুকতেই একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছুটতে থাকে ওদের গাড়ির পিছনে। একটা বড়ো লোহার গেটের সামনে থামতেই ছেলেমেয়ের দল ওদের ঘিরে ধরে। ওদের লজেন্স দেয় সৌগত আর অমিতাভ। বন্ধ গেটের ওদিকে এসে দাঁড়ায় দারোয়ান।

'ম্যাডামকে বলো ডাক্তারবাবুরা এসেছেন।'

'ম্যাডাম তো নেই স্যার। সদরে গেছেন, আসতে সন্ধ্যা হবে।'

'তাই নাকি... তাহলে...'

'ভেতরে আসুন স্যার। আমি খবর দিচ্ছি।'

মোরাম বাঁধানো পথে দুপাশে যত্নে সাজানো বাগানের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ায় ব্রিটিশ আমলের একটা লাল ইটের বড়ো বাড়ির সামনে। বিরাট কম্পাউন্ডের এদিকে ওদিকে আরও অনেক ছোটো বড়ো বাড়ি। বাড়িগুলোর সামনে সযত্নে লালিত ছোটো ছোটো বাগান। লাল ইটের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসেন সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক।

'এতদিন পরে মনে পড়ল?'

'স্যার এসেছেন... আপনাদের স্কুল দেখতে।'

'নমস্কার... আমি পবিত্র দাশগুপ্ত... ভাইস প্রিন্সিপাল।'

'নমস্কার মাস্টারমশাই... আমি ধীমান রায়চৌধুরি।'

'আপনার পরিচয় দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না ডাক্তারবাবু। আমার এক আত্মীয়কে আপনি বাঁচিয়েছিলেন... আমার বাড়িও কলকাতায়।'

'তাই নাকি, আপনাদের স্কুলটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর!'

'আসুন... আপনাদের দেখাই... ম্যাডাম থাকলে খুব খুশি হতেন। সদরে গেছেন, ডি এম অফিসে।'

'এখানে এত পুরোনো একটা স্কুল আছে জানতামই না... এই বাড়িটা তো ব্রিটিশ আমলের!'

'সামনের বছর স্কুলের রজতজয়ন্তী। এ বাড়িটা অবশ্য আরও অনেক পুরোনো... নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল।'

'বলেন কী! নীলকুঠি!'

'হ্যাঁ... এটাই আমাদের মেন বিল্ডিং। ওদিকে গার্লস হস্টেল, টিচার্স কোয়ার্টার... বয়েজ হস্টেলটা এদিকে... আসুন।'

'আপনাদের স্কুল দেখতে দেখতে আমার স্কুলের কথা মনে পড়ছে... আমিও একদা একটা বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র ছিলাম...।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় ধীমান।

'তবে তো আপনার আরও ভালো লাগবে... আমাদের ছেলেমেয়েরা গার্ডেনিং করে। ফুল, শাকসবজি... ম্যাডামের খুব বাগান করার শখ।'

'খুব ভালো।'

'সতি বলতে কী... এত কিছু ছিল না এখানে। দশ বছর হল ম্যাডাম বদলি হয়ে এসেছেন। ম্যাডামের উৎসাহেই এত কিছু! খুব চেষ্টা করেন... গভর্নমেন্টের কাছে লেখালিখি, ছুটোছুটি... এই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা... সব।'

'বাঃ।'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, উনি অন্যরকম মানুষ। বছর তিনেক আগে ওঁনার বদলির সম্ভাবনার কথা শুনতেই স্টুডেন্টদের গার্জেন থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ সবাই মাস পিটিশন, ডেপুটেশন দিয়ে বদলি আটকে দেয়।'

'ওঁনার সঙ্গে আলাপ হলে ভালো লাগত।'

'এসে পড়তে পারেন আপনারা থাকতে থাকতে... না হলে, আপনি এসেছিলেন শুনলে হয়তো কালই গিয়ে আলাপ করে আসবেন।'

'আজ তাহলে আসি মাস্টারমশাই।'

'চা না খেয়ে? আসুন আসুন... ভেতরে আসুন। অ্যাই রমাপদ, স্যারদের জন্য চা আনো... তাড়াতাড়ি।'

প্রিন্সিপালের ঘরের দরজাটা খুলে ধরে পবিত্র দাশগুপ্ত বলেন, 'আসুন'।

বিরাট একটা টেবিলের একদিকে প্রিন্সিপালের চেয়ার। অন্য পাশে অতিথিদের বসার জন্য সুদৃশ্য গদিমোড়া চেয়ার। গোটা ঘরটার সজ্জায় অসম্ভব পরিশীলিত রুচির ছাপ।

দেওয়ালে সুদৃশ্য ফ্রেমে রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজি, গান্ধিজি আর বাবাসাহেব আম্বেদকারের ছবির সঙ্গেই আছে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা নানান ছবি। একটা আলমারিতে অনেক বই।

'ম্যাডামের বইয়ের নেশা। লেখালিখিও করেন।'

বাঁশের ট্রেতে করে চা নিয়ে আসে রমাপদ। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য কাপ প্লেট রেখে চা ঢেলে এগিয়ে দেয় ধীমানের দিকে। ওর হাত লেগে উলটে যায় পেনস্ট্যান্ডের পাশে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো একটা পোস্টকার্ড সাইজ ছবি। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় ধীমান। ছবিটায় চোখ পড়তেই বিস্ময়। অবাক হয়ে ছবিটা দেখতে থাকে ও। মুহূর্তে চোখের সামনে একরাশ চলমান দৃশ্যপট। ধূসর দিনগুলোর এলোমেলো বিন্যাস। ওর এই হঠাৎ স্তব্ধতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাকিদের। সযত্নে ছবিটা টেবলের ওপর রাখে ধীমান। 'ম্যাডামের বাবা। উনিও হেডমাস্টার মশাই ছিলেন।'

চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে ধীমান।

'চলি, মাস্টারমশাই।'

'চাটা ভালো করে খাওয়া হল না। এত কড়া করে ফেলে রমাপদ...।'

'না, না... চা তো ভালোই হয়েছে... আজ চলি... নমস্কার।' 'নমস্কার ডাক্তারবাবু... ম্যাডাম ফিরলেই বলব।'

গেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে অপরাহ্নের ম্লান আলো মিশে গেছে আকাশের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়। বেতের টেবিলে রাখা গ্লাসে স্বচ্ছ মেহগনি-রঙা তরল। জ্যোৎস্নায় ডুবে যেতে থাকে ধীমান।

সদ্য শেষ হয়েছে ক্লাস ইলেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা। ছুটি মেলেনি হেডস্যারের কঠোর অনুশাসনে। শুরু হয়ে গেছে টুয়েলভের ক্লাস। উঁচু পাঁচিল ঘেরা স্কুলে বাঁধাধরা জীবন। সারাদিন টানা ক্লাস আর টিউটোরিয়ালের তাড়না। ব্যতিক্রম শুধু ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা। যদিও শরীরচর্চার কড়া নির্দেশ, তবু ওই সময়ে ছাত্ররা স্বাধীন। বিকেলে খেলার মাঠেও হাজির থাকেন গেম টিচার। হেডস্যারের আদেশ অমান্য করে কার সাধ্য। স্যার আশুতোষের মতো গোঁফ আর হাই পাওয়ার চশমায় মূর্তিমান বিভীষিকা মহেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ছাত্রমহলে 'হেড়ু'র আর এক নাম 'টর্পেডো'। সামনে এসে দাঁড়ালে অতি সাহসী ছাত্রেরও হাঁটু কাঁপতে থাকে। তাঁর অঙ্কের ক্লাস মানে আগের রাত নির্ঘুম। খেলা বা শরীরচর্চার সময়ে মহেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু অন্য মানুষ। খেলার মাঠের পাশেই তাঁর কোয়ার্টার। কখনো-সখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসাহও দেন।

ভোরবেলাটা একদম অন্যরকম। রোজ সকালে জগিং করতে করতে হেডস্যারের কোয়ার্টারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে টুয়েলভ সায়েন্সের ফার্স্টবয় ধীমান। সঙ্গে থাকে স্বপন। আর্টসের ছাত্র স্বপন হাজরার বাঁ পাটা একটু বাঁকা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেশ খারাপই হয়েছিল ওর। হেডস্যার রাজিই ছিলেন না ওকে স্কুলে রাখতে। খুব কান্নাকাটি করছিল স্বপন। ওই নম্বরে বাইরে কোথাও ভরতি হওয়া আরও কঠিন।